Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume –2, Issue-iii, published on July 2022, Page No. 202–209
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

বাণী বসুর উপন্যাস উজান-যাত্রা : অতীতের আলোকমালায় স্বাধীনতা পরবর্তী ভারত ভাবনা

ড. লতিফ উদ্দীন
সহকারী অধ্যাপক
চাপড়া সরকারি মহাবিদ্যালয়
ই-মেইল : uddin231496@gmail.com

Keyword
উজান-যাত্রা', আদি ভারতবর্ষ, পুরুষতান্ত্রিক, নারী বঞ্চনা, জীবনদর্শন, কলাকৌশল, চরিত্র গঠন, গঠন কাঠামো

Abstract
'উজান-যাত্রা' পরবর্তিত ভারতের নতুন পথের সন্ধান এঁকেছে। বহুধা বিভক্ত ভারতবর্ষে সামাজিক সন্ধির যে আত্মবিন্যাসে মুক্তির যর্থাথতা রয়েছে এ উপন্যাসের চরিত্রগুলি তাকে সদর্থক রঙে ছড়িয়ে দিয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক স্তর থেকে উঠে আসা মানুষের আত্মবিশ্লেষণ, আত্মানুসন্ধান ও পারস্পরিক ভাববিনিময়ের মধ্যে নিয়ত পরিবর্তিত ভারতীয় মূল্যবোধের ভাঙাগড়ার অনুসন্ধান লক্ষ্য করি এ আখ্যানে।

ভারতীয়ত্বের শিকড় সন্ধান যেমন আমাদের শক্তি তেমনি পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর বঞ্চনার ইতিহাস আমাদের দুর্বলতা। নারীর মনস্তত্ত্ব বোধহয় মহিলা কলমে অনেকবেশি বাস্তবতা পায়। এ সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাকার বাণী বসুর 'শ্বেতপাথরের থালা'য় আমরা তেমনটাই দেখেছি। তবে একথাও ঠিক তারাশঙ্করের উপন্যাস, গল্পে নারীচরিত্রের যে জটিল আদিম প্রবৃত্তির উৎসমুখ দেখি এখানে তা দুর্লভ। আবার রবীন্দ্রনাথ, বনফুল, সুবোধঘোষ, আশাপূর্ণা দেবীর কলমের নারীভাবনার স্পর্শ পাই বাণী বসুর কথায়। আলোচ্য প্রবন্ধে উঠে এসেছে এসবই।

গবেষণাধর্মীতা 'মৈত্রয় জাতক'এর কথাকারের অন্যতম অবলম্বন। আলোচিত 'উজান-যাত্রা' উপন্যাসে তার ছাপ আছে সর্বত্র। আদিবাসী এবং প্রাচীন ভারতীয় অনার্য সংস্কৃতির সন্ধানে তাঁর খোঁজ তারিফ করার মতোই।

মূল প্রবন্ধে এসবের অনুসন্ধান এবং পর্যবক্ষণ যেমন আছে, তেননি নতুন জীবনাদর্শ ও আত্মসম্মিলনের উজান- যাত্রাও আছে। গঠনরীতি, চরিত্র, পটভূমির বিভিন্ন আঙ্গিকের মধ্যে খোঁজ করা হয়েছে সহজ প্রবাহমান আখ্যনের শিল্পরীতির মধ্যে সাহিত্যধারার যে সার্থকতা রয়েছে তাকেও।

Discussion
'উজান-যাত্রায়' বাণী বসু এমন এক আত্তীকরণের কথা বলেছেন যা বর্তমান ভারতবর্ষের তবে তা অতীতের শিকড়মালায় দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতের বিশ্লেষণ। আদি ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষের আদিবাসী জীবন তার সঙ্গে মানুষের চিরায়ত শিকড় সন্ধানের

মধ্যে দিয়ে বর্তমানকে মেপে নেওয়া। উপন্যাসের বিষয় স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষ হলেও অতীতের অনুরাগ মিশ্রিত সন্ধান চলেছে গোটা উপন্যাস জুড়ে।

স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষে অজস্র মূল্যবান উপন্যাস রচিত হয়েছে তাদের প্রায় প্রতিটি নিজস্বতায় উজ্জ্বল।আমরা জানি উপন্যাসের রচনাশৈলীতে রচয়িতার নিজস্ব অভিজ্ঞতা, জীবনদর্শন, স্টাইল তাঁর মৌলিকত্ব সৃষ্টিতে বড় ভূমিকা নেয়। উজান-যাত্রার আলোচনার প্রসঙ্গে এর মৌলিকত্বের স্বাদ যেমন নেওয়া যাবে তেমনি পরখ করে নেওয়া যাবে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা উপন্যাসের কলাকৌশল, চরিত্র গঠন, ভাষা এবং গঠনশৈলীর আধুনিকতাকে। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা সমগ্র প্রবন্ধটিকে ৬টি পরিচ্ছেদে ভাগ করে নিয়েছি যথা –

ক. কাহিনির কেন্দ্রে কস্তুরী বেন
খ. আত্মকথন রীতির অনন্য গঠনশৈলী
গ. সমাজ ভাবনাঃ মনস্তাত্ত্বিক বিবর্তন এবং ভবিষ্য ভারত গঠনের দিশা
ঘ. অপ্রধান নারী চরিত্রঃ মিতু এবং শিখরিণী
ঙ. ভাষার প্রবাহমানতা
চ. আদিবাসী সংস্কৃতির সন্ধানঃ জীবন দর্শনের আলোয়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ক. কাহিনির কেন্দ্রে কস্তুরী বেন :

কস্তুরী বেন গুজরাটের 'কটন কিং'। পঞ্চাশ বছর পরে কলকাতায় এসেছেন মাকে খঁজতে। তাঁর এই গতিপথে মিশেছে আদিবাসী যুবক গবেষক কাজল সিং মুণ্ডা– কলকাতার মেয়ে এনজিও কর্মী মৈত্রী ব্যানার্জী– রানাঘাটের অভিজাত পরিবারের মেয়ে অধ্যাপিকা শিখরিনী পালচৌধুরী। তিনজন ভিন্ন সমাজ এবং শ্রেণি থেকে এসেছেন। তাদের ভাবনা, মনস্তাত্ত্বিক বিকাশ গঠনে কাজ করেছে দীর্ঘকালীন ভারতবর্ষীয় সমাজ ও পরিমণ্ডল। এদের মধ্যে একটা ত্রিকোণও তৈরী হয়েছে যার পরিণতি দানে বড় ভুমিকা নিয়েছে অন্তর শায়িত সেই সমাজ-সংস্কৃতি ভাবনা। এদের মাধ্যমেই তাঁর মাকে খোঁজার পথ পেয়েছেন কস্তুরী বেন। যে মা (সৎ) তাঁকে ছেড়ে চলে এসেছিলেন। বাঁকুড়া পুরুলিয়ার অবহেলিত আদিবাসীদের সভ্যতার আলোর স্পর্শ দেওয়ার যিনি সফল সৈনিক।কস্তুরী বেন যে আদর্শ যে স্বাধীন ভারতের আদর্শ যে দেশ গঠনের স্বপ্ন মনের মধ্যে সযত্নে লালন পালন করেছেন তাঁর মা বাঁকুড়া মেদিনীপুরের আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেছেন। উপন্যাসের শেষে কস্তুরী বেন তাই মা এবং দেশকে নতুন করে আবিষ্কার করেছেন।আর কাজল,মৈত্রী এবং শিখরিণীকে নিয়ে তৈরী হয়েছে বর্তমানের সঙ্গে অতীতের সম্পর্ক গঠনের খেলা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

খ. আত্মকথন রীতির অনন্য গঠনশৈলী :

বাংলা উপন্যাসের সূচনালগ্নে দাঁড়িয়ে বঙ্কিম কাহিনিকে মাত্রাতিরিক্ত গুরত্ব দিয়েছেন বটে তেমনি আঙ্গিক গঠনেও যথেষ্ট পরীক্ষা নিরীক্ষাও করেছেন।'উজান-যাত্রার' আলোচনা প্রসঙ্গে এসে বঙ্কিমকে স্মরণ করার কারণ তাঁর স্টাইলের অনন্যতা। আত্মকথন এবং পরিচ্ছেদ বিভাগের যে বিন্যাস 'উজান-যাত্রা'র প্রাণ তা 'কপালকুণ্ডলা', 'রজনী'র সার্থক উত্তরসূরি। রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গে'ও শচীশ-শ্রীবিলাস-দামিনীর নিজস্ব ঢঙে বলা মনোবিকাশও যে অসাধারণ তা বলাই বাহুল্য।

উজানযাত্রা উপন্যাসে এই বিন্যাস কৌশল তথা পরিচ্ছেদ বিভাগ চরিত্রগুলোর স্বাভাবিক আত্মকথন-কাহিনির সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে নিটোল সৌন্দর্য সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে।উপন্যাসের শুরুর পরিচ্ছেদ - "আমি তিনি ও সে" অবশ্য নামকরণের দিক থেকে কিছুটা খাপছাড়া । শুরুটা বিষয়ের সঙ্গে ইঙ্গিতযুক্ত হলে ভালো হত। তেমনি কাজল

মুন্ডাকে আরম্ভেই যেভাবে adamant দেখানো হয়েছে তার সঙ্গে বিলেত-বাসীতে পরিণত কাজলের প্রথম পরিচয়টা সম্পূর্ণ হয়না।

উপন্যাসের গঠন কাঠামো গঠিত হয়েছে মানানসই ভাবে। কুড়িটি পরিচ্ছেদ জুড়ে একটা প্রস্তুতি নির্মিত হয়েছে যা একুশতম পরিচ্ছেদে এসে পেয়েছে পূর্ণতা। শিরোনাম রচনায় সর্বনামের পরিবর্তে (তিনি-আমি-সে) এগারতম পরিচ্ছেদে "যাত্র শুরু" বলার মাধ্যমে নিপুণ দক্ষতায় সরাসরি পৌঁছে যাওয়ার চেষ্টা হয়েছে শীর্ষবিন্দুতে। বারোতম পরিচ্ছেদে প্রথম দ্বিতীয় ইত্যাদি বলার পর পঞ্চম পর্বে সমাধান রচিত হয়েছে। আঙ্গিকে যে সূক্ষ্মতা আছে তা যেমন পরিচ্ছেদ বিভাগ,গতিক্রম ইত্যাদি প্রমাণ রাখে তেমনি উপন্যাসের শেষে কাজলের জীবনসঙ্গী ঠিক করে দেওয়ার কৌশলও ভোলার নয়। এখানে কাজল বা মৈত্রী কেউই সরাসরি কথা বলেনি কিন্তু প্রথম পুরুষের (তুই) ব্যবহার নিশ্চিত করে দেয় ওটা শিখরিণী (তুমি) নয় মিতু-মৈত্রী ব্যনার্জী। কাজলের এই সিদ্ধান্তের পিছনে রয়েছে কেবল তার নয় একটা জাতি ও দেশের আত্মানুসন্ধান। অভিজাত বংশের মেয়ে শিখরিনীকে জীবনসঙ্গীকে হিসাবে পাওয়ার পরিবর্তে সে নিজের মুণ্ডা পরিচয় ত্যাগ করতে চায় না। এই আধুনিক সভ্যজতের শীর্ষে তাকে যে মুণ্ডারির বিজয় পতাকা ওড়াতে হবে। পরবর্তী পরিচ্ছেদে আমরা এর মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় যাব।

উপন্যাসের বিন্যাসে নূতনত্ব এবং অন্তিমে কল্পনার আবেশ থাকলেও বেশ কয়েকটি প্রশ্ন চিহ্ন প্রাসঙ্গিক। যথা শিখরিনীকে রূপ দিতে কি বেশি সময় দেওয়া হয়েছে? তার আভিজাত্যের কথা কি স্পষ্ট দুএকথায় সারা যেত না? কস্তুরী বেনের স্বাধীনতাযুদ্ধকালীন ভারতবর্ষের স্মৃতিচারণা কি পৌনঃপুনিকতা দোষে দুষ্ট নয়? মৈত্রীর মায়ের মৃত্যুর ব্যাপারটাও স্পষ্ট নয়। তেমনই মনোসমীক্ষণের দিক থেকে বিস্তারিত ব্যাখ্যার দাবি রাখে কেনো কস্তুরী বেন দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পর এতো তীব্রভাবে ইতিহাসের অনুসন্ধানে লিপ্ত হয়েছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সমাজ ভাবনা : মনস্তাত্ত্বিক বিবর্তন-ভবিষ্য ভারত গঠনের দিশা :

লেখিকা উপন্যাসের সূচনাতেই পরিচ্ছেদ বিভাগের শিরোনামে (প্রথম পরিচ্ছেদ-'আমি'-মিঠু/মিতু 'তিনি'-কস্তুরী ও 'সে'-কাজল) কাজলকে তৃতীয় পুরুষ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন ঠিকই কিন্তু সে উপন্যাসের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। অন্তর্দ্বন্দ্ব কাজলেই বেশি। তারাশঙ্করের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র 'করালী'র সঙ্গে তার মিলের থেকে অমিলই বেশি। তবে দুজনেই তাদের আদিবাসী জীবনের গণ্ডী থেকে বার হতে চেয়েছে। করালী চেষ্টা করেছিল স্বভূমিতে ফিরে এসে পরিবর্তনের একটা আঁচ দেওয়ার। অন্যদিকে কাজলের স্বভূমির প্রতি একটা চাপা ক্ষোভ থেকে গিয়েছে, তাঁর বেদনাময় স্মৃতিচারণ-

> "শালপাতার দোনায় করে খুদ সেদ্ধ আর বামলা আলু, যা নাকি তার মা বন থেকে তেড়ে নিয়ে আসত সে কি ভুলতে পারে! সে কি ভুলতে পারে উপোসি বালক ছেঁড়া জামা গায়ে পাঁচ মাইল হেঁটে নিম্ন বিদ্যালয়ে যাচ্ছে- রাস্তায় হোঁচট খেয়ে গোড়ালি থেকে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে এল। পঞ্চা মাস্টার ঠিক সেইখানটাতেই খুঁচিয়ে দিল।"[১]

অতীতের প্রতি বিতৃষ্ণা থাকলেও অতীতকে সে প্রতিষ্ঠা করতে চায় ,নিজের মুণ্ডা পরিচয়টা স্পষ্ট করে প্রকাশ করতে চায়।তার কোনো দ্বিধা নেই নিজের পরিচয় নিয়ে-

> "আই'ল রিমেন আ মুণ্ডা অল মাই লাইফ।আমি কিছুর জন্যই আমার জাতি পরিচয় বিসর্জন দেব না"[২]

পরিচয়ের এই স্বাতন্ত্র্যতার জন্য কাজল আধুনিক সভ্য জগতের সঙ্গে মিশেও আলাদা থাকতে ইচ্ছুক।এই খানেই বাণী বসুর পর্যবেক্ষণ ভাবায়। উচ্চ বর্ণ বা এগিয়ে থাকা মানুষের সঙ্গে মিশেও কোথাও একটা ফারাক রাখতে চায় সে কেনো? তাহলে কি স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষের সমাজ ভাবনায় নিম্ন বর্ণ অবহেলিত? না কি তাঁর অতীতের বঞ্চনা ও সংস্কারের

মধ্যেই রয়েছে হীনমন্যতার বীজ? না কি উচ্চ বর্ণের আগ্রাসনের প্রতি এটা তার প্রতিরোধ।তবে আদিবাসী জীবন থেকে উত্তরিত হয়ে আসার পর সে স্বপ্ন দেখে সৎ শ্রেণি বৈষম্যহীন সমৃদ্ধ সুশাসিত এক ভারতের। আদিবাসী জীবন ও তাঁদের অধিকার নিয়ে মহাশ্বেতা দেবীর লড়াইয়ের কথা প্রসঙ্গত চলে আসে।'অরণ্যের অধিকার'এ আমরা দেখি বীরসা মুণ্ডার আপসহীন সংগ্রামের কথা যদিও তার পটভূমি ভিন্ন।একটা দিক বীরসার মতো কাজলেও বিস্তারলাভ করেছে তা হল খ্রিস্টান মিশনারীদের প্রভাব।সেই প্রভাবের পিছনে ধর্মপ্রচার ছিল কিন্তু শিক্ষার আলোটাও ওখান থেকেই ঠিকরে পড়েছে সেটা অস্বীকার করা যায় না। বিষয়টা ভিন্ন একটা গবেষণার দাবি রাখে। কাজলের অনেক ভাবনার সঙ্গে কস্তুরী বেনের মিল আছে ।আবার কস্তুরী বেনের ভাবনার মধ্যে রয়েছে লেখিকার জীবনাদর্শের ছাপ আছে তা আমরা বুঝতে পারি-

> "ব্যক্তিগত বা দলগত আত্মপরতা, অপরকে দাবিয়ে রাখার প্রবৃত্তি আর সাম্রাজ্যবাদে চরিত্রগত কোনও ফারাক নেই। সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন। কথাটা স্বাধীন ভারতবর্ষে বড্ড খেটে গিয়েছিল, গেছে। ব্যক্তিগত, দলগত, আত্মপরতা- এই নিয়ে আমরা ঘর করছি। দেশপ্রেম আর নেই।"[৩]

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী অন্যতম হিন্দুমুসলিম সমস্যা নিয়ে কস্তুরী বেনের বাবার বন্ধুর জবানীতে আমরা পাই-

> "গুজরাত-কাণ্ডের পর বাবার এক বন্ধু রমেশকাকা বললেন- জাতীয়তাবাদের পরিণাম তো এই নরেন্দ্র।স্বাধীনতার পর কতগুলো দাঙ্গা হল, কতগুলো রাজ্য বিচ্ছিন্ন হতে চাইল, দ্যাখো। সারা ভারত কোনওদিন এক জাতি হবে না, জাতীয়বাদ প্রচার করলে এইরকম উগ্র রূপই নেবে।"[৪]

ভারতবর্ষের এক জাতি হিসাবে গড়ে উঠবার উপায় তাহলে কী? এই প্রশ্নের উত্তর কস্তুরী বেনের বাবা দিয়েছেন আমাদের মনে হয় লেখিকার মত ও তাই। শিক্ষিত সমাজের মূলস্রোতে থাকা আদিবাসী যুবকের প্রতিনিধি কাজল মুণ্ডার দাবির সঙ্গে তা মিলে যায়।কস্তুরী বেন বলেন-

> "বাবা বলেছিলেন, ভারতকে সেভাবে এক জাতি হতে কে বলেছে? ইউরোপকে দূর থেকে আমরা এক জাতি বলে ভাবি, তুমি তো জানো,তা নয়। ইংরেজ চরিত্রে আর ফরাসি চরিত্রে আকাশপাতাল ফারাক। আমরা তেমনই আলাদা হয়েও পরস্পরের সঙ্গে বন্ধুভাবে থাকব। আর দেশের প্রতি, দেশের মানুষের প্রতি আমাদের ভালোবাসা দায়িত্ববোধ আমাদের চালিত করবে।"[৫]

কাজল মুণ্ডা এই সত্যকে অবলম্বন করে বলে-

> "নির্দল মানে কি সত্যি নির্দল? কারও সঙ্গে যোগ দেব না। ইচ্ছের বিরুদ্ধে বোঝাপাড়ায় যাব না 'রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা'র জন্যে।নিজের বিবেক মতো চলবো!"[৬]

কাজল মুণ্ডার এই অস্তিত্বের সংকট পিছিয়ে পড়া জনজাতির মধ্যে থেকে উঠে আসা মানুষের চিরন্তন সমস্যা। তারা একদিকে পুরোনো জীবনের মধ্যে নিজেদের মেশাতে পারেনা আবার অন্যদিকে তথাকথিত প্রগতিশীল সমাজে এসে পরিচয় হারিয়ে ফেলাকে মেনে নিতে পারে না। বিশ্বায়নের যুগে ছোট ছোট জন গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক পরিচয় টিকিয়ে রাখা একটা বড় চ্যালেঞ্জ।সেদিক থেকে কাজল মুণ্ডার প্রতিরোধ ও অগ্রসরণের লড়াই একটা সার্বিক জনগোষ্ঠীর বিবর্তনের লড়াই। ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে মানুষের আমরণ লড়াইয়ের কথা আমরা ইতিহাসে খুব সহজেই পাব। মাতৃভাষার জন্য অপার বাংলার বাঙালিদের লড়াই তো আজ বিশ্ববন্দিত। এই সময়ের অন্যতম জনপ্রিয় ওপন্যাসিক সেলিনা হোসেনের 'যাপিত জীবন' উপন্যাসে আমরা সেই লড়াইয়ের জীবন্ত ছবি পাই।

অন্যদিকে উজান-যাত্রা উপন্যাসে কস্তুরীবেন নিজেই একটা প্লট। 'শ্বেতপাথরের থালা' বন্দনার সঙ্গে তার একক সংগ্রামী জীবনের বেশ মিল আছে। দুজনেই অল্পদিনেই বিধবা হলেও জীবনসংগ্রামে হেরে যাননি।বন্দনা রক্ষণশীলতার মাঝে পরিবর্তন এনেছিলেন আর কস্তুরী পরিবর্তনকে বাঁধতে চেয়েছেন সংযমে। কস্তুরী বেনের মাও নিজ আদর্শের জন্য পরিবার থেকে স্বতন্ত্র হয়েছেন। আমরা যদি অনেকখানি পিছিয়ে যায় তাহলে মেরি ওলস্টোনক্র্যাফটের গ্রন্থ 'আ ভিন্ডিকেশন অফ দ্য রাইটস অফ উইমেন' এর কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতেই পারি। সন্তনের শিক্ষার পিছনে মা'এর অবদান কিছু কম নয়, কস্তুরী বেনের উপর তার মার প্রভাব সেই কথাই বলে। পাশাপাশি নারীর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং পুরুষের কর্মসঙ্গী হয়ে ওঠার মধ্যেই সামাজিক অগ্রসরতা লুকিয়ে আছে তাও প্রচার করে। এই উপন্যাস এমনতরো সমাজভাবনাকেই উৎসাহিত করে।

বাঙালি পালিত সৎ মা আর গুজরাটি বাবার সন্তান মধ্য পঞ্চাশের কস্তুরী বেন তার এই মাকে খঁজতে চেয়েছেন যে তাকে সস্নেহে পালন করার পর একটা সময় সব ছেড়ে চলে এসেছিলেন নিজস্ব ভাবনা ও আদর্শে বশীভূত হয়ে। সেই আদর্শের অন্যতম ছিল পুরুলিয়া বাঁকুড়া আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে সভ্যতার আলো পৌঁছে দেওয়া। এই মায়ের আদর্শে উদ্বুদ্ধ কস্তুরী বেন তাঁকে খুঁজে বেড়িয়েছেন সমগ্র উপন্যাস জুড়ে। স্বাধীনতাসংগ্রামী মায়ের খোঁজ আসলে সেই ভারতবর্ষের খোঁজও যে ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখেছিলেন সেদিনের স্বাধীনতাসংগ্রামীরা। দেশের বর্তমান অবস্থায় বিব্রত অসহায় কস্তুরী বেনের স্বাধীনতাসংগ্রামী বাবার কথা তুলে ধরে-

> "কিন্তু নিজের দেশের শিশুদের ফুডে, রোগীদের ওষুধে ভেজাল মিশিয়ে দিচ্ছে, সদ্য সদ্য স্বাধীন হয়ে- এ আর কোথাও পাবে না। নিজের রাস্তা নোংরা করছে, ট্রাম বাস পোড়াচ্ছে যা নাকি নিজেদের টাকা দিয়েই কেনা - ...সততা দেখাতে গেলে অবধারিত মৃত্যু ...স্বাধীন চিন্তা প্রকাশ করলে কণ্ঠ চেপে ধরবে ...এই জিনিসও অচিন্তনীয়।"[৭]

দেশের প্রতি তার এই ভালোবাসার ভিত্তি গড়ে দিয়েছিলেন তার মা। বাবার সঙ্গে মতের মিল না হয়ায় মা তাকে ছেড়ে চলে এসেছিলেন। মায়ের প্রতি একটা চাপা ক্ষোভ ছিল তার। কিন্তু যখন পুরুলিয়া বাঁকুড়া মেদিনীপুর জুড়ে মায়ের কর্মকাণ্ডের হদিশ পান তখন মাকে তিনি নতুন করে আবিষ্কার করেন।যে নতুন দেশের স্বপ্ন তিনি দেখেন, সেদিনের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা দেখতেন 'মা' তাকেই বাস্তবায়িত করার জন্যই সবছেড়ে চলে এসেছিলেন। চাণ্ডিল থানার ছোট্ট গ্রাম নিমডিতে এসে তার অনুসন্ধান ফলপ্রসূ হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অপ্রধান নারী চরিত্রঃ মিতু এবং শিখরিণী-

মৈত্রী ব্যানর্জী অনেকটা সূত্রধরের কাজ করেছে। সাধারণ বাঙালি মেয়ে তবে মিতু প্রগতিশীল, নিস্পৃহ নয়। সময়ের অশুভ প্রভাব থেকে সে নিজেকে সরিয়ে রাখতে চায়, বন্ধুদের পর্যবেক্ষণ করে তাদের দোষত্রুটিকে লক্ষ্য করে দূর থেকে। আত্মসম্মান নিয়ে যথেষ্ট সচেতন। পাড়াতুতো দাদা 'দীপকদা'র বিশ্বাসঘাতকতা ,মায়ের মৃত্যু তাকে ভিতরে ভিতরে কঠোর করে দেয়। কাজলকে ভালবাসলেও বলতে পারে না। কাজলে ঝগড়া আসলে তার ভালোবাসারই ভিন্ন প্রকাশ। অন্যদিকে শিখরিণী বনেদীয়ানায় ও আভিজাত্যে মধ্যে মানুষ। ওর দৃষ্টিভঙ্গীটাও গড়ে উঠেছে ওই স্তর থেকেই। কাজল মুণ্ডাকে সেই কারণেই কাজল সিং বানাতে চায়। জীবনের বাঁধাগতের মধ্যে তার বিচরণ তার বাইরে বেরোনোর ইচ্ছা বা সামর্থ্য কোনটাই তার নেই।গভীর কোন আদর্শে সে উদ্বুদ্ধ নয় যেটা আমরা দেখি কস্তুরী বেনের চরিত্রে।

উপন্যাসের চরিত্রগুলোর উপর আলোকপাত করার পর বলতেই হয় কাজল ও কস্তুরী বেনের চরিত্রে যে মনোসমীক্ষণ দেখি অন্যদের ক্ষেত্রে তার অভাব আছে। মনের গহন দেশে অবগাহনের ইচ্ছা দেখায়নি কেউ। কাজল যেমন মিতু-শিখরিণী সম্পর্কে স্পষ্ট মতামত প্রকাশ করেনি তেমনি এদের প্রণয় সম্পর্ক নিয়ে ঔপন্যাসিক তেমন আগ্রহ

দেখাননি। বড্ডবেশি শুদ্ধতার মোড়ক দেওয়া হয়েছে এদের ভিতরের প্রণয় নিয়ে। ডি. এইচ. লরেন্সের উপন্যাস পড়া লেখিকার কাছ থেকে প্রণয় সম্পর্ক গঠনে এর থেকে বেশি আশা করাই যেতে পারে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ভাষার প্রবাহমানতা :

উপন্যাসের ভাষা উতরে গেছে বললে কম বলা হয়। ভাষা বুদ্ধিদীপ্ত প্রাসঙ্গিক হয়েছে তবে সূক্ষ তাৎপর্যবাহী প্রবাহমান হয়েছে। ভাষার ভিতর নাগরিক স্মার্টনেস পর্যাপ্ত যেমন-

> "কাজলের ভুরুর কোঁচ ফিকে হয়ে আসছে কিন্তু এখনও পুরোপুরি যায়নি। কাপড় টাপড় ইস্ত্রি করতে গেলে পয়লাবার ইস্ত্রি চালাবার পর যেমন হালকা একটা অমসৃণ ভাব থেকে যায় তেমন।" (উজান-যাত্রা/বাণী বসু)

উপমা ব্যবহারের এই আধুনিকতা সত্যিই প্রশংসনীয়। যেমন মিতু তার পূর্বপ্রেম সম্পর্কে যখন বলে "আমার প্রেমটা চটকে গেল" তখন তা যেমন তার চরিত্রের সঙ্গে খাপ খায় তেমনি সমসাময়িক জনপ্রিয় শব্দাবলির ব্যবহার সার্থকভাবে তার মনোভাবের প্রকাশ ঘটায়।

ভাষা ব্যবহারে যেদিকটা ঘাটতি রয়েছে তা হল কাজল-মিতু-শিখরিণী যেহেতু ভিন্ন পরিবেশ থেকে এসেছে তাতে তাদের ভাষা ব্যবহারে পার্থক্য থাকবে সেটাই স্বাভাবিক কিন্তু এখানে তেমনটা আমরা দেখিনা। কাজল দীর্ঘদিন কোলকাতায় থাকলেও পূর্ব জীবনের ব্যবহৃত ভাষার টান তার ভাষাতে থাকবে না তা হতে পারে না।আবার শিখরিণী নদিয়ার মেয়ে সুতরাং তার আর মিতুর ভাষার মধ্যে সামান্য তফাৎ প্রবাদপ্রবচনের এদিক ওদিক থাকা দরকার ছিল।

একথা ঠিক অনেক কিছু কারিকুরি ভাষায় না থাকলেও ভাষা সহজ স্বাভাবিক ভাবপ্রকাশে সক্ষম। পরিবেশ বজায় রাখতে বুদ্ধিদীপ্ত হালকা রসিকতা জমিয়েছেন দক্ষ লেখিকা।উদাহরণ স্বরূপ দেওয়া যায় কস্তুরী বেনের বাড়িতে মিতুর রসগোল্লা খাওয়ার প্রসঙ্গটি-

> "রসই যদি ফেলে দিলে তোবে রসগোল্লা কী? দিস ইজ আওয়ার স্পেশাল ফেভারিট ইন আমেদাবাদ। আগে জানলে তোমাকে তিত গোল্লা খাওয়াতাম।"[৮]

কস্তুরী বেনের এই ভাষা খুবই শ্রুতি মধুর যেমন তার বলা 'ছুটুবেলা সব বেলা' যেন উপন্যাসের প্রাণমূল থেকে উৎসারিত এক অমোঘ উক্তি। তারই মুখ থেকে প্রচলিত কয়েকটি বাংলা অনুবাদ নতুন করে শোনা গেল "একানে যদি ভাব খিচড়ি ওমলেট করে তো সে বালি গুড়ে" তেমনি wit এর ঝকঝকে প্রয়োগ কম নেই উপন্যাসে একটি উদাহরণই যথেষ্ট- প্রবল বৃষ্টিতে রেনকোট পরা মিতু যখন কস্তুরী বেনের বাড়িতে ঢোকে-

> "মিতু বাইরে থেকে গলা বাড়িয়ে বলল, জলো জিনিসগুলো বাইরে রেখে শুকনো আমি ভেতরে ঢুকছি।" [৯]

ভাষার কারিকুরি করেছেন সমাপ্তি পর্যায়েও সেখানে চরিত্রনাম নেই কিন্তু প্রথম পুরুষের আলাপন বুঝিয়ে দেয় কথা বলছে মতু ও কাজল যা পাঠককেও মনোযোগী হতে নির্দশ দেয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আদিবাসী সংস্কৃতি সন্ধান : জীবন দর্শনের আলোয় :

উপন্যাসের অন্তরগত সত্য দাঁড়িয়ে থাকে ঔপন্যাসিকের জীবন দর্শনের উপর। 'মৈত্রয় জাতকে' বাণী বসু যে সামাজিক পরিবর্তনের ছবি এঁকেছিলেন, যথা কৃষিজীবী, বৃত্তিজীবী, ভূমিধিকারী নাগরিক, ছোট ব্যবসায়ী, কবি, নটী, দাস প্রভৃতির শাশ্বত জীবনচর্যাকে তুলে ধরার মধ্যে দিয়ে আলোচিত উপন্যাসে তার পরবর্তী প্রবাহমান রূপ স্পষ্ট। 'মৈত্রয় জাতক'এ তিনি বলেছিলেন সম্পদ হয়ে উঠেছে প্রকৃত ক্ষমতার উৎস। বাণিজ্য সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রজীবী এবং

শস্ত্রজীবীদের পিছনে ফেলে এগিয়ে এসেছেন বণিক শ্রমজীবী। বহু শতাব্দীর ব্যবধানের পটভূমিতে নির্মিত আলোচিত উপন্যাসে লেখিকার অসন্তোষ চাপা থাকেনি ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থার দিকে তাকিয়ে। বর্তমান ভারতে মানুষ একক বিচ্ছিন্ন, জাতপাত ধর্মে বহুধা বিভক্ত – রক্তস্নাত।

বর্তমান ভারতবর্ষের গ্লানির চিত্র আমরা উপন্যাস থেকে দেখিয়েছি তবে এই উপন্যাসে উঠে আসা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচিত প্রেক্ষাপট হল ট্রাইবাল জীবনের অন্তরভূম। অনেকের লেখায় আজকাল আদিবাসী জীবন স্থান পাচ্ছে কিন্তু এই উপন্যাসে অসম্ভব শ্রদ্ধা ভালোবাসার সঙ্গে আদিবাসী জীবন আলোচিত।বর্তমানে 'দলিত সাহিত্য' নামক যে সাহিত্যধারা আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু তার যে অন্যতম মাপকাঠি যে একজন দলিতই প্রকৃত দলিত সাহিত্যের স্রষ্টা হতে পারে বলে মনে করেন কেউ কেউ তাকে স্বচ্ছন্দে ভুল প্রমাণ করতে পারে।

অত্যন্ত জোরের সঙ্গে লেখিকা সমাজের মূলস্রোতের থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষদের অস্তিত্বের সন্ধান করেছেন তাদের পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে আসতে চেয়েছেন।কাজল মুণ্ডাকে সামনে রেখে তিনি জানিয়েছেন এঁদের প্রতিভা কম নয়। এ বিষয়ে তাঁর গবেষণাধর্মী লেখনী প্রশংসার দাবি রাখে বিশেষত যেভাবে তিনি মহেঞ্জোদারো শব্দের অর্থ ব্যখ্যা করেছেন-

> "হড় মানে মানুষ; আদিবাসীরা সবাই হড়। শুধু বিরহড়রা নয়। তপা মানে সমাধি, হড়প্পা মানুষের সমাধি...। মহের সঙ্গে য়েন দিলে মহেন হয় যার মানে প্রস্ফুটিত। 'জ' মানে ফল, মুণ্ডারিতে দারে বা দারু হল বৃক্ষ। মহেনজোদারো মানে তাহলে প্রস্ফুটিত ফল বা বৃক্ষ।"[১০]

উপন্যাস জুড়ে বিভিন্ন আঙ্গিকে আদিবাসী সংস্কৃতির কথা,মারাংবুরুর পূজা,বাবার থান প্রভৃতির ব্যখ্যা আছে। আদিবাসী পুরাণে যেভাবে মানুষের আগমনের কথা আছে তা প্রায় সব ধর্মের মূলের সঙ্গে সঙ্গতি রাখে-

> "পৃথিবি তখন জলময়। মাটি অনেক নীচে।ঠাকুর জিউ কাঁকড়া, হাঙর, কুমি্ রাঘববোয়াল, কচ্ছপ সব সৃষ্টি করলেন। তারপর মাটি দিয়ে মানুষ গড়লেন কিন্তু আকাশ থেকে সূর্যের ঘোড়া সিঞ সাদম একটা রূপালি সুতো- তড়ে সুগম দিয়ে নেমে এসে ভেঙে দিল। তখন নিজের বুকের ময়লা দিয়ে হাঁস হাঁসালি গড়লেন, ফুঁ দিলেন। তারা উড়ে বেড়াতে লাগল। তবে হাঁস হাঁসালি কিন্তু কণ্ঠার দুদিকের দুটো হাড়েরও নাম। ...বিয়ের সময় আমাদের কনেকে হাঁসুলি উপহার দেওয়া হয়, কণ্ঠার হাড়ের উপর লেগে থাকে তাই হাঁসুলি।"[১১]

আদিবাসী জীবনের উৎস সন্ধান করতে করতে লেখিকা বর্তমান ভারত সম্পর্কে তাঁর ক্ষোভের কথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন।মিতুর বান্ধবীদের প্রসঙ্গ নিয়ে এসে এই অতিআধুনিক যুগেও মেয়েদের অস্তিত্বহীনতার কথা বলেছেন।সহজ ভাষায় স্পষ্ট করে দিয়েছেন ভবিষ্যত ভারতের ললাট লিখন-

> "কোটিপতি ভারত, দারিদ্র্যসীমার নীচের ভারত, মুসলিম ভারত, হিন্দু ভারত এবং সবকিছুকে ছাপিয়ে ক্রমশ মাথা তুলছে মার্কিনভারত।"[১২]

ধর্ম সম্পর্ক তাঁর সুচিন্তিত মতামত জলের মত সরল কিন্তু তীব্র প্রতিবাদী-

> "ধর্ম হল মানধর্ম তার বেসিক মনুষ্যত্ব। মুণ্ডারিতে ধিরি মানে হল পাহাড় বা পাথর। ধিরি থেকে স্যানসক্রিটাইজড হয়ে হল ধৃ। তার থেকে ধর্ম যা পর্বতের মত অচল অটল মূল প্রপাটি মনুষ্যত্বের। সেই ধর্মই যদি না থাকল তবে কী রইল।"[১৩]

শুধু কি ধর্মের বিভাজন বা অর্থের বৈষম্য আমাদের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে যে কতরকমের শ্রেণি বিন্যাস আছে তা তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারেনি-

"কতরকমের শ্রেণিবিভাগ আমাদের এই জেনারেশনের মধ্যেও।মেয়েরা প্যান্ট পরে সিগারেট গাঁজা খায়।যারা অন্য কিছু পরে, ওসব খায় না। যাদের মায়েরা চাকরি করেন।যাদের মায়েরা করেন না।যারা সায়েন্স পড়ে, যারা আর্টস পড়ে, টেকনিক্যাল স্কুল, ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারী ...সব কিছুর একটা অদৃশ্য গোপন রেটিং আছে।" (উজান-যাত্রা/বাণী বসু)

কথাশেষে একটা বড় আক্ষেপ রয়ে যায় গ্রন্থটি যতটি প্রচার পাওয়া উচিত ছিল ততটি না পাওয়ায়। আমাদের আশা বাণী বসুর অন্যান্য বহুল আলোচিত গ্রন্থমালায় এটিও স্থান পাবে।খুব সহজ ভাষায় আমাদের সামনে উঠে এসেছে অতি গুরুত্বপূর্ণ বহু বিষয়। প্রবন্ধে সন্ধান করা হয়েছে সেসবের অন্তর্লীন অভিজ্ঞান। আগামী ভারতবর্ষের দিশা সন্ধানে তা মজবুত ভূমিকা নেবে এ বিশ্বাস আমাদের আছে। উজান-যাত্রা তাই অবশ্য পাঠ্য হয়ে উঠুক প্রকৃত ভারতপ্রেমিকের। 'উজান-যাত্রা' এই সময়ের যাত্রা, ভবিষ্যতের দিকে আমাদের উত্তরণের যাত্রা।যে যাত্রায় আমরা প্রচলিত চেপে বসা ধারণাকে সরিয়ে দৃষ্টিভঙ্গীর বদল ঘটিয়ে নতুন ভারত গঠনের শপথ নেব।

তথ্যসূত্র :

১. বসু, বাণী, উজান-যাত্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-০৯, পৃ. ৭৮
২. ঐ, পৃ. ১৭৬
৩. ঐ, পৃ. ১৭৬
৪. ঐ, পৃ. ১৯০
৫. ঐ, পৃ. ১৯০
৬. ঐ, পৃ. ৮০
৭. ঐ, পৃ. ১৯০
৮. ঐ, পৃ. ১৬
৯. ঐ, প্রৃ. ৮৭
১০. ঐ, পৃ. ১০৯
১১. ঐ, পৃ. ১৬৯
১২. ঐ, পৃ. ১৩৩
১৩. ঐ, পৃ. ১৩৩ - ১৩৪

সহায়ক গ্রন্থ :

ক. মৈত্রয় জাতক, বাণী বসু, আনন্দ, কলকাতা ০৯
খ. শ্বেত পাথরের থালা, বাণী বসু, আনন্দ, কলকাতা ০৯
গ. অরণ্যের অধিকার, মহাশ্বেতা দেবী, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা ০৯
ঘ. পছন্দের পাঁচ উপন্যাস, সেলিনা হোসেন, দিয়া, কলকাতা ০৯
ঙ. উপন্যাস সমগ্র (১৩২), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পুনশ্চ, কলকাতা ০৯
চ. বঙ্কিম রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, সমগ্র উপন্যাস, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা ০৯
ছ. বাংলা উপন্যাস, দ্বান্দিক দর্পণ, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, পঃবঃ আকাদেমি, কলকাতা ৭০০০২০
জ. বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ, কলকাতা ৭০০০৭৩
ঝ. বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা, সত্যেন্দ্রনাথ রায়, দে'জ, কলকাতা ৭০০০৭৩